অধ্যায় ১০

ভূপৃষ্ঠ ও প্লেট টেকটোনিকস তত্ত্ব

অধ্যায় ১০ ভূপৃষ্ঠ ও প্লেট টেকটোনিকস তত্ত্ব

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ পৃথিবীর সৃষ্টি
- ☑ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্তর
- ☑ মহাদেশ ও টেকটনিকস
- ☑ টেকটোনিক প্লেটের স্থানান্তর
- ☑ সমুদ্রের সৃষ্টি ও সমুদ্রতলের প্রসারণ

পৃথিবীর সৃষ্টি

পৃথিবীতে আমরা আকাশে সারা বছর বিভিন্ন রকম মেঘ দেখতে পাই। বর্ষাকালে আকাশ একটু বেশি মেঘলা থাকে এবং এলাকাভেদে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এর কারণ হলো, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মেঘ মূলত পানির অতি ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। তবে পৃথিবীর বাইরে মহাকাশেও এক ধরনের মেঘ রয়েছে, যাকে নেবুলা (Nebula) বলা হয়। এসব নেবুলা পৃথিবীর মেঘের, পৃথিবীর কিংবা সূর্য বা সৌরজগত থেকেও অনেক বড় আকারের হয়ে থাকে। নেবুলা মূলত তৈরি হয়েছিল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে, তার সঙ্গে সামান্য পরিমাণে অন্যান্য মৌলও থাকে। সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছে এমনই এক নেবুলা থেকে। সেই নেবুলার অধিকাংশ নিয়ে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে সৌর জগতের একমাত্র নক্ষত্র সূর্য। সূর্য গঠিত হওয়ার সময় বা তার কিছু পরে নেবুলার বাকি উপাদান নিয়ে তৈরি হয় পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু ইত্যাদি।

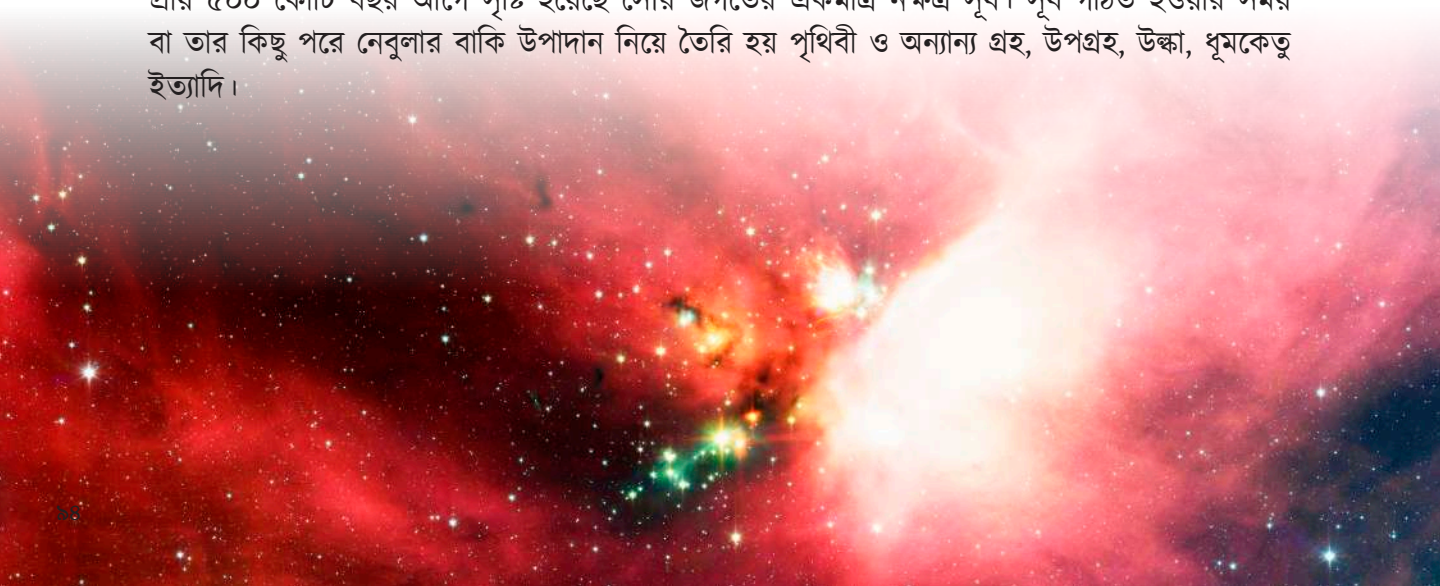

এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নেবুলা থেকে সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছে কীভাবে। মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু অন্য আরেকটি বস্তুকে মহাকর্ষ বল দিয়ে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ নির্ভর করে বস্তুগুলোর ভর এবং সেগুলোর মধ্যে দূরত্বের উপর। এই আকর্ষণের কারণে আমরা উপরে লাফ দিলেও আবার মাটিতে এসে পড়ি কিংবা একটি ঢিল আকাশের দিকে ছুড়ে মারলেও তা আবার নিচে এসে পড়ে। নেবুলার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রে যেখানে গ্যাস ঘন অবস্থায় ছিল বা গ্যাসের অণু পরমাণুগুলো কাছাকাছি ছিল, মহাকর্ষ বলের কারণে সেখানে বাকি গ্যাস জড়ো হতে শুরু করে। নেবুলার গ্যাস ক্রমাগত জড়ো হওয়ার কারণে কেন্দ্রে ভর বাড়তে থাকে এবং তখন সেখানে আরো বেশি গ্যাস ও মহাজাগতিক ধূলিকণা আকর্ষণ করতে থাকে। একপর্যায়ে সেখানে তাপ ও চাপ এত বেড়ে যায় যে ফিউশন (fusion) নামক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ ও আলো সৃষ্টি হতে থাকে এবং সূর্য একটি নক্ষত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাকি যে গ্যাস ও ধূলিকণা অবশিষ্ট থাকে, সেগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে এবং এক পর্যায়ে পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ সৃষ্টি হয়। এই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে শুরু করেছে আজ থেকে অন্তত ৪৫০ কোটি বছর আগে। প্রাথমিক অবস্থায় পৃথিবী অনেক উত্তপ্ত ছিল। সেই সময় পৃথিবীর উপরিভাগ ছিল তরল এবং প্রবহমান। সময় প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ঠান্ডা হতে থাকে। এর বাইরের অংশ শক্ত হয়ে তৈরি হয় ভূত্বক। ভূত্বক আবার অনেকগুলো ছোট বড় প্লেটে বিভক্ত যা ক্রমাগত অতি ধীরে নড়াচড়া করছে।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্তর

আমরা আমাদের সামনের বিভিন্ন বস্তু থেকে শুরু করে আকাশের চাঁদ-তারা প্রভৃতি নিজের চোখে দেখতে পারি। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন আমরা সরাসরি দেখতে পাই না। এ জন্য ভূতাত্ত্বিকরা ভূমিকম্পের সময় সিসমিক ওয়েভ (Seismic wave) নামে যে বিশেষ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেটি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এই তরঙ্গ

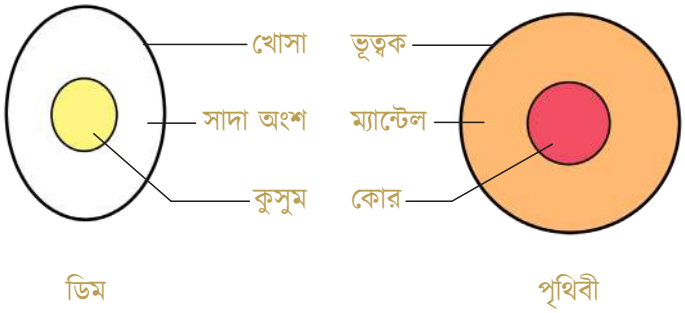

পৃথিবীর গঠনের সঙ্গে ডিমের মিল

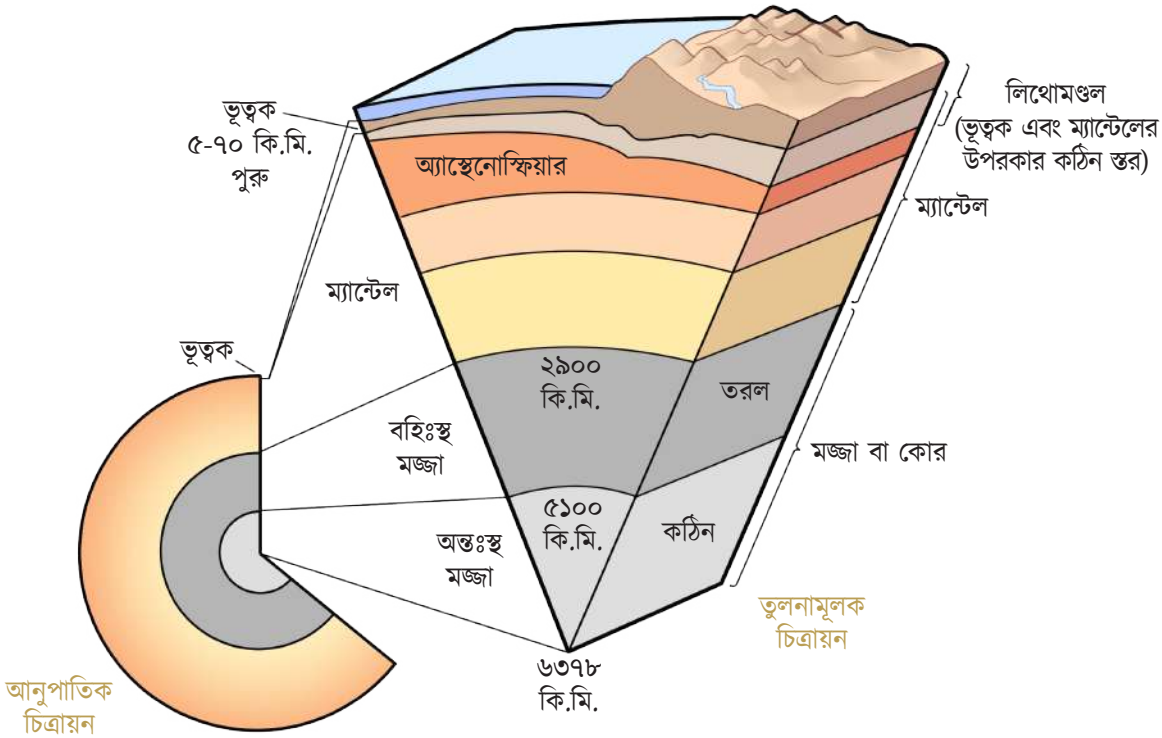

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন

ভূমিকম্পের কেন্দ্রে তৈরি হয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের বিভিন্ন ধরনের বস্তু থেকে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয় এবং বিভিন্ন গতিতে চলাচল করে। চিকিৎসকেরা যেমন রোগীর শরীরের অভ্যন্তরের অবস্থা বোঝার জন্য ECG, X-Ray কিংবা CT-Scan ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে থাকেন, সেভাবে ভূতাত্ত্বিকরা সিসমিক ওয়েভের মাধ্যমে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনের ধারণা পেয়ে থাকেন।

পৃথিবীর গঠনের সঙ্গে ডিমের গঠনের এক ধরনের মিল রয়েছে। ডিমের যে রকম বাইরে খুবই পাতলা একটি শক্ত খোসা, পৃথিবীরও সেরকম বাইরে রয়েছে ভূত্বক। খোসার পরে ডিমের যে রকম রয়েছে ভেতরের সাদা অংশ, পৃথিবীর অভ্যন্তরেও সেরকম রয়েছে ভূ-আচ্ছাদন বা ম্যান্টল। ডিমের যেরকম মাঝখানের রয়েছে কুসুম, ঠিক সে রকম পৃথিবীর কেন্দ্রেও রয়েছে তার মজ্জা বা কোর। অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনকে ভূত্বক, ম্যান্টেল এবং কোর এই তিনটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়।

ভূত্বক (Crust): পৃথিবীর সবচেয়ে উপরের স্তরকে ভূত্বক বা ক্রাস্ট (Crust) বলা হয়। আমরা এই স্তরের উপরে থাকি এবং স্বাভাবিকভাবেই এই ত্বক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানি। এই স্তরটি অন্যান্য স্তরের তুলনায় পাতলা ও ভঙ্গুর। পুরুত্ব সর্বনিম্ন ৫ থেকে সর্বোচ্চ ৭০ কিলোমিটার। এই ত্বককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, (১) তুলনামূলকভাবে পুরু এবং কম ঘনত্বের মহাদেশীয় ভূত্বক এবং (২) তুলনামূলকভাবে সরু কিন্তু বেশি ঘনত্বের মহাসাগরীয় ভূত্বক হিসেবে। এই দুই প্রকার ভূত্বকই নানান ধরনের পাথর দ্বারা নির্মিত।

ম্যান্টল (Mantle): ভূত্বকের পরের স্তরটির নাম ম্যান্টল। ভূত্বকের সঙ্গে লাগানো ম্যান্টেলের স্তরটি কঠিন এবং ভঙ্গুর। উপরের ভূত্বক এবং নিচের এই স্তর নিয়ে তৈরি কঠিন অংশকে লিথোমণ্ডল (Lithosphere)

বলে। এই লিথোমণ্ডল এই স্তরটি বড় বড় বেশ কয়েকটি টুকরায় বিভক্ত এবং সেগুলোকে টেকটোনিক প্লেট বলে। লিথোমণ্ডলের পরের স্তরে বেশি তাপমাত্রার কারণে পাথর গলিত অবস্থায় থাকে বলে সেটি পুরোপুরি কঠিন নয়। তাই তার উপর ভাসমান টেকটোনিক প্লেট মোটেও স্থির নয়, সেগুলো বিভিন্ন দিকে বছরে ৩ থেকে ৫ সেন্টিমিটার সরে যেতে থাকে। টেকটোনিক প্লেটের এই গতিবিধি আমাদের ভূমণ্ডলের গঠনে খুব বড় একটি ভূমিকা পালন করে, টেকটোনিক প্লেটের গতিবিধির কারণেই পর্বতমালা এবং গভীর সমুদ্রে খাদের সৃষ্টি হয়েছে, এর কারণেই পৃথিবীতে ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাত হয়ে থাকে।

ম্যান্টেলের বাকি অংশটুকু পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনের সবচেয়ে পুরু স্তর। এটি প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার পুরু এবং পৃথিবীর প্রায় ৮৫ শতাংশই এই ম্যান্টেল দিয়ে গঠিত। এই স্তরে তাপ এবং চাপ অত্যন্ত বেশি। ম্যান্টেলের ভেতরের স্তর কোর থেকে আগত তাপের পরিচলন ম্যান্টলের উপরে ভাসমান লিথোমণ্ডলকে স্থানান্তর করার প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে।

মজ্জা বা কোর (Core): ম্যান্টলের নিচে রয়েছে মজ্জা বা কোর। পৃথিবী সৃষ্টির সময় যখন এটি অনেক উত্তপ্ত এবং তরল অবস্থায় ছিল, তখন লোহা, নিকেল এবং অন্যান্য ভারী মৌল মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে পৃথিবীর কেন্দ্রে এসে জমা হয়। কাজেই এই স্তরে লোহা ও নিকেল ধাতুর প্রাধান্য রয়েছে, সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য ভারী ধাতু। মজ্জা বা কোর দুই অংশে বিভক্ত, উপরের অংশটি বা বহিঃস্থ মজ্জা তরল এবং সেটি প্রবাহিত হতে পারে। এই স্তরের উপরের ম্যান্টল ও অন্যান্য স্তরের ভরের কারণে এখানে চাপও বেশি। লোহা এবং নিকেলের প্রবাহের কারণে এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় এবং সেই বিদ্যুতের কারণে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে থাকে। তোমরা সবাই জানো, এই চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্য পৃথিবীতে কোনো চুম্বক ঝুলিয়ে দিলে সেটি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ঝুলে থাকে। এই চৌম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে সূর্যের ক্ষতিকর সৌর ঝড় থেকে রক্ষা করে বলে পৃথিবীর বিভিন্ন জীবের বেঁচে থাকার জন্য এই চৌম্বক ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীর একেবারে অভ্যন্তরে রয়েছে অন্তঃস্থ মজ্জা। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য বহিঃস্থ মজ্জার মতোই তবে তাপ এবং চাপ আরও বেশি। অধিক চাপের কারণে এই স্তর কঠিন। ধারণা করা হয় যে অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ মজ্জার গঠনকারী উপাদানের মধ্যে যেসব মৌল তেজস্ক্রিয়, সেগুলোর তেজস্ক্রিয়তা পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ উত্তাপের উৎস।

মহাদেশ ও টেকটনিকস

মহাদেশগুলোর অপসরণ

মহাদেশ বলতে পৃথিবীর সমুদ্রের (অথবা মহাসাগরের) পানির উপরে অবস্থিত স্থলভাগকে বোঝানো হয়, পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেশের তিনভাগই পানি এবং মাত্র এক ভাগ স্থল।

আদি পৃথিবীর উত্তপ্ত তরল উপরিভাগ ধীরে ধীরে ক্রমাগত ঠান্ডা হবার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান কঠিন ভূত্বক। কিন্তু এর উপরিভাগ কঠিন এবং শীতল হলেও ভূত্বকের নিচের অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তর এখনও উত্তপ্ত। ভূত্বক এবং ম্যান্টলের উপরের কঠিন অংশ নিয়ে যে লিথোমণ্ডল গঠিত, সেটি তার নিচের ম্যান্টলের অপেক্ষাকৃত তরল বা সঞ্চালনশীল অংশের উপর অতি ধীরে গতিশীল রয়েছে। লিথোমণ্ডল অনেকগুলো

মহাদেশীয় এবং মহাসাগরীয় প্লেটে বিভক্ত। এই সকল প্লেটে নানান দিকে গতিশীলতাকে প্লেট টেকটোনিক বলা হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে। তোমরা হয়তো বাসায় চুলার উপর পাত্রে দুধ গরম করার সময় তাতে সর পড়তে দেখেছ। দেখবে চুলার আগুনে আঁচ কমিয়ে দুধ জাল দিলে সর নড়াচড়া করে। দুধের সরের গতিশীলতা বেশি হওয়ায় তা আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু টেকটোনিক প্লেটের গতি (বছরে ৩ থেকে ৫ সেন্টিমিটার মাত্র) অতি অল্প হবার কারণে তা আমরা সরাসরি দেখতে পাই না। তবে কয়েক লক্ষ বছর ধরে এই গতি চললে তা ভূপৃষ্ঠে অনেক পরিবর্তন আনে। টেকটোনিক প্লেটের এই গতির ফলে প্লেটের উপর অবস্থিত মহাদেশগুলোও গতিশীল হয়। কখনো মহাদেশগুলো একটি অপরটির দিকে অগ্রসর হয়, আবার কখনো একটি অপরটি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। একে মহাদেশের অপসরণ বলে। এমন ঘটনার কারণে দক্ষিণ আমেরিকা কয়েক কোটি বছরে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। একসময় এই দুটি মহাদেশ একত্রে ছিল যার প্রমাণ উভয় মহাদেশ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্ম থেকে পাওয়া গেছে।

প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে

১৫ কোটি বছর আগে

১০ কোটি বছর আগে

বর্তমানে

মহাদেশগুলোর ধীরে ধীরে সরে যাওয়া

প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সকল মহাদেশ মিলে একটি বৃহৎ মহাদেশ ছিল যার নাম ছিল প্যাঞ্জিয়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ভেঙে অনেকগুলো মহাদেশে বিভক্ত হয়েছে। আবার একই কারণে বর্তমান ভারত অস্ট্রেলিয়া থেকে পৃথক হয়ে বর্তমান এশিয়া মহাদেশের অংশ হয়ে গেছে এবং যে স্থানে সংযোগ ঘটেছে, সেখানে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা।

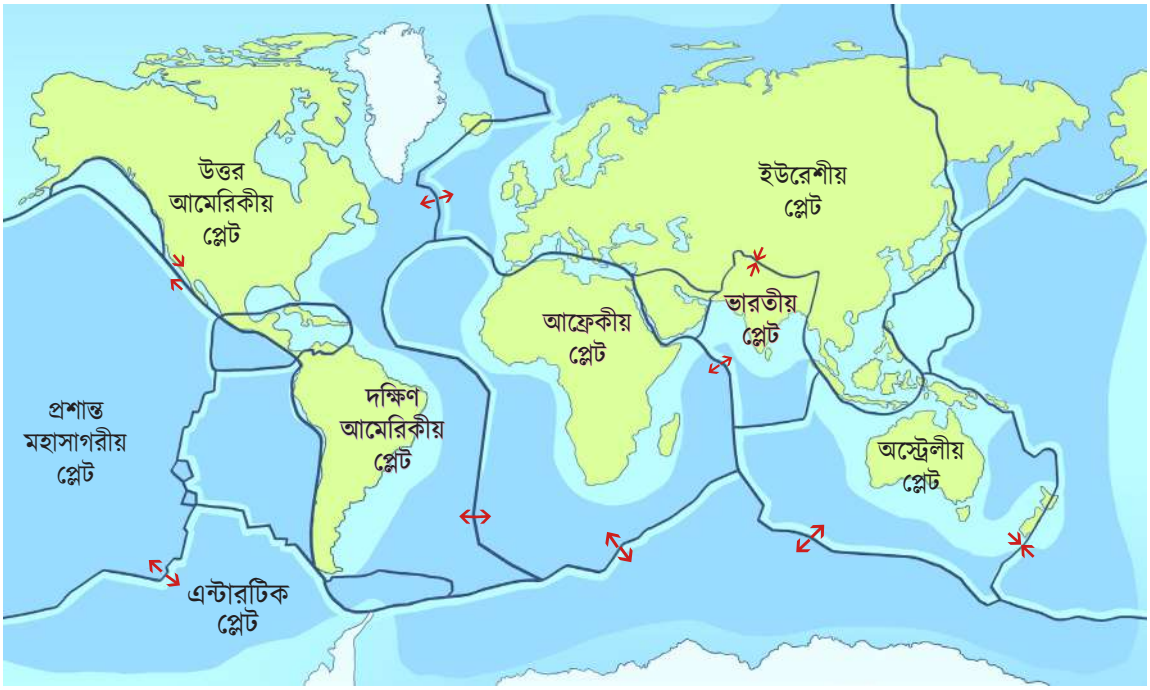

ছবিতে পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি টেকটোনিক প্লেটের অবস্থান দেখানো হলো। এখানে তীর চিহ্ন দ্বারা টেকটনিক প্লেটগুলোর গতির দিক দেখানো হয়েছে।

টেকটোনিক প্লেটের স্থানান্তর

তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ যে লিথোস্ফিয়ার বেশ কয়েকটি ছোট-বড় টেকটনিক প্লেটে বিভক্ত এবং সেগুলো বিভিন্ন দিকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। তোমরা তাপের তিনটি প্রবাহ সম্পর্কে পড়ার সময় 'পরিচলন তাপের প্রবাহ' পড়েছ, ম্যান্টলের ভেতরেও সে ব্যাপারটি ঘটে। ম্যান্টলের মধ্যে যে পরিচলন স্রোত কাজ করে, তার কারণে তার উপরে ভাসমান টেকটোনিক প্লেটগুলো বিভিন্ন দিকে গতিশীল হয়। যে সকল এলাকায় দুটি টেকটোনিক প্লেট পাশাপাশি অবস্থান করে, সেখানে সেগুলোর মধ্যে নিচের তিন ধরনের যেকোনো এক প্রকার স্থানান্তর দেখা যায়।

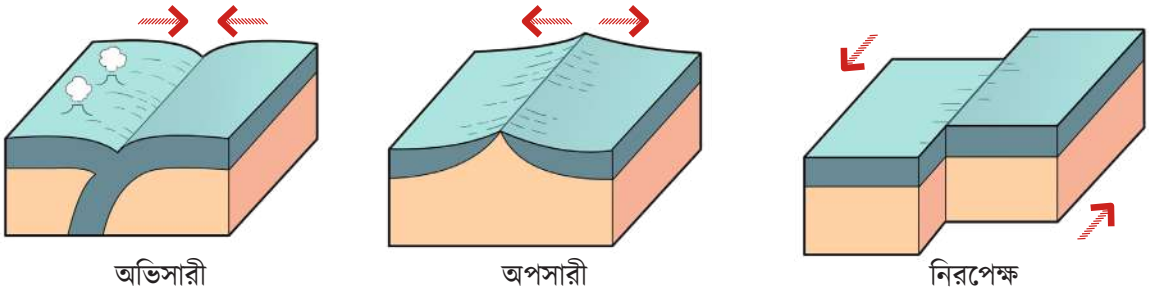

টেকটোনিক প্লেট বা পাতের বিভিন্ন ধরনের সীমানায় পাতের স্থানান্তর।

ভারতীয় টেকটোনিক প্লেট এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে তৈরি হয়েছে হিমালয় পর্বতমালা

অভিসারী (Subduction): প্লেটগুলো একটি অপরটির দিকে এসে সংঘর্ষ ঘটতে পারে। তখন তুলনামূলকভাবে ভারী প্লেটটি অন্য প্লেটের নিচে ঢুকে যায়। সংঘর্ষের সীমানায় যেটি উপরে থাকে, সেটি উপরে ওঠার সময় পর্বতমালা তৈরি করে। ভারতীয় টেকটোনিক প্লেট এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে এভাবে হিমালয় পর্বতমালা তৈরি হয়েছে। সংঘর্ষের সীমানায় ভারতীয় প্লেট ইউরেশিয়ান প্লেটের নিচে ঢুকে গেছে। অভিসারী গতির কারণে বিভিন্ন প্রকার আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রার ভূমিকম্পও হয়ে থাকে।

মিড আটলান্টিক রিজ

অপসারী (Spreading): টেকটোনিক প্লেটগুলো যখন একটি অপরটি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তখন সেগুলোর সীমানাকে বলে অপসারী প্লেট সীমানা। অপসারী প্লেট সীমানার সবচেয়ে চমকপ্রদ উদাহরণ হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া মিড আটলান্টিক রিজ। সমুদ্রের তলদেশ থেকে বের হয়ে যখন এটি আইসল্যান্ডের ভেতর দিয়ে গেছে তখন স্থলভাগেও এটি দেখা যায়। অপসারী গতির কারণে সাধারণত সমুদ্রের তলদেশের বিভিন্ন প্রকার আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়।

নিরপেক্ষ (Lateral): একটি প্লেট অপরটির সঙ্গে পাশাপাশি পিছলে যেতে পারে তখন দুটো প্লেটের সংযোগস্থলকে বলে নিরপেক্ষ প্লেট সীমানা। এই ধরনের স্থানান্তরের কারণে সেই প্লেটের সীমানাতে প্রচুর শক্তি সঞ্চিত হয় এবং যখন সেই শক্তি সীমানার ধারণক্ষমতার বেশি হয়ে যায়, তখন ভূমিকম্পের মাধ্যমে সেই শক্তি নির্গত হয়। একটি অত্যন্ত পরিচিত নিরপেক্ষ প্লেট সীমানা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া সান এন্ড্রিয়াজ ফল্ট লাইন। এই সীমানায় অচিন্তনীয় পরিমাণ শক্তি জমা হয়ে আছে বলে অনুমান করা হয় এবং যে কোনো সময়ে একটি বড় ভূমিকম্পের মাধ্যমে শক্তি নির্গত হবে বলে আশঙ্কা করা হয়।

সান এন্ড্রিয়াজ ফল্ট লাইন

সমুদ্রের সৃষ্টি ও সমুদ্রতলের প্রসারণ

অতিমহাদেশ প্যাঞ্জিয়ার সময় পুরো পৃথিবীতে মহাসাগরও ছিল একটি, যার নাম ছিলো টেথিস সাগর (Tethis sea)। এই সাগর সৃষ্টি হতেও অনেক কোটি বছর সময় লেগেছে। মূলত নেবুলা থেকে পৃথিবী সৃষ্টির পর তাতে বহু বছর ধরে প্রচুর উল্কাপাত হয়, সেগুলোতে অবস্থিত পানি ছিল বর্তমান পৃথিবীর সাগরের পানির উৎস। এ ছাড়া পৃথিবীর গঠনের পর যে গ্যাসীয় পানি ভূত্বক থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠে বেরিয়ে আসে তা-ও পৃথিবীর মহাসাগরের পানির উৎস।

আমরা আগে দেখেছি যে টেকটোনিক প্লেটের গতিশীলতা তিন ধরনের হতে পারে। যখন একটি প্লেট অপরটি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তখন সেই ফাঁকা স্থানে নতুন মহাসাগরীয় প্লেট সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে সমুদ্রতলের প্রসারণ হয়ে থাকে। এই কারণে বর্তমান দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশ একটি অপরটি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং মহাদেশ দুটির মাঝে সৃষ্টি হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর।

অনুশীলনী ?

১। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬ হাজার কিলোমিটার, এর মাঝে পৃথিবীর ম্যান্টল পৃথিবীর ব্যাসার্ধের অর্ধেক ৩ হাজার কিলোমিটার পুরু। কিন্তু এই ম্যান্টল পৃথিবীর ৮৫% অংশ ধারণ করে। তার কারণ কী?